সংস্কৃত শিখে ও অল্প বয়সে বিবাহ করে অভিভাবকদের বিরাগভাজন হওয়া, কারাবাস, সন্ন্যাস-জীবন যাপন, ভালোভাবে ফার্সী শিক্ষা, জীবিকার সন্ধানে বহুবিধ উপায় অনুসন্ধান, শেষে কৃষ্ণচন্দ্র রাজার সভাকবি, মূলাজোড়ে রাজ-আশ্রয় প্রাপ্তি, সেখানেও শত্রুলাভ— তাঁর জীবনের ঝুলিকে নানা অভিজ্ঞতায় পূর্ণ করেছে। জীবনের এই উত্থান-পতন কিন্তু তাঁর সাহিত্য-চর্চাকে ব্যাহত করতে পারে নি। ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর বিখ্যাত 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যটি কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায়—তাঁরই নির্দেশে লেখা হয়। তিনি তিন পুত্রের জনক। ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

২.ঘ.১. 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে মোট ছয়টি কাহিনী আছে : ১. শিবপার্বতীর উপাখ্যান, ২. ব্যাস-বৃত্তান্ত। এই দুটি কাহিনীর উপাদান পুরাণ থেকে সংগৃহীত। ৩. হরিহোড়ের উপাখ্যান, ৪. ভবানন্দের উপাখ্যান—এ-দুটির কাহিনীতে মৌলিকতা আছে এবং এর দ্বিতীয়টির বিষয় হলো তাঁর আশ্রয়দাতার পূর্বপুরুষের অন্নদাকৃপাপ্রাপ্তি। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ভারতচন্দ্র ছাড়া আর কোন 'মঙ্গল'-কবিই তাঁর সামনে উপস্থিত জীবন্ত মানুষকে দৈবীকৃপা লাভ ও অবতারত্বের সঙ্গে এভাবে যুক্ত করে দেন নি। [মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ভবানন্দের বংশধর আর ভবানন্দ স্বর্গের দেবতা নলকুবেরের অবতার, অতএব কৃষ্ণচন্দ্র হলেন দেব-অবতার বংশের মানুষ]। ৫. বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী, যা সমগ্র কাব্যের একটি অসংলগ্ন অংশ; এ-মূল কাহিনীর সঙ্গে খাপ খায় নি, এমন কি এর দেবীও ভিন্ন—অন্নপূর্ণা নয়, কালিকা। এরপর, ৬. মানসিংহ পালা। যশোরাধিপতি, প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে মোঘল সেনাপতি মানসিংহের যুদ্ধে ভবানন্দের মানসিংহকে সহায়তা দান ও দিল্লীর বাদশাহের কাছে থেকে রাজ্যপ্রাপ্তি ইত্যাদি ঐতিহাসিক-কাল্পনিক উপাদানে এই পালা রচিত। এই অংশ বিভাগ থেকে দেখা যাচ্ছে; 'ইহার প্রথম খণ্ডে দেবতা, দ্বিতীয় খণ্ডে মানুষ এবং তৃতীয় খণ্ডে অতীত ইতিহাস প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ইহার তৃতীয় খণ্ড বা মানসিংহ কাব্য রচনায় ভারতচন্দ্রের প্রতিভার একটা নতুন দিকের সঙ্গে পরিচয় লাভ করা যায়'।

অন্নদামঙ্গল চণ্ডীমঙ্গলের অনুসরণেই রচিত, চণ্ডীর সঙ্গে অন্নদার সম্পর্ক দূরতর নয়। এইভাবে মঙ্গলকাব্যের আধারেই তিনি 'নতুন মঙ্গল' রচনার চেষ্টা করেছেন।

আসলে দৃষ্টিভঙ্গী এবং style-এর পার্থক্যই তাঁকে মঙ্গলকাব্য ধারায় এক পৃথক আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। মাত্র আটচল্লিশ বছরের জীবনে তিনি যে হলাহল পান করেছিলেন তাকে তিনি গতানুগতিক রচনা প্রক্রিয়ার আধারে ভরে সমাজকে ফিরিয়ে দিতে দ্বিধা করেন নি। 'ভারতচন্দ্রের মতো উচ্চশিক্ষিত, তত্ত্বজ্ঞ এবং বহুদর্শী পণ্ডিত ও প্রতিভাবান কবিকে [এবং কতকটা আত্মম্ভরী বলে নিজের গুণবিষয়ে সচেতন : 'পড়িয়াছি যেইমত লিখিবারে পারি,/ কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি।।'] বারে বারে ধনাঢ্য ব্যক্তিদের আশ্রয় ভিক্ষা করে, অর্থানুকূল্য লাভ করে কৃপার ভিখারী হয়ে খোসামুদে মোসাহেবের জীবন কাটাতে হয়েছে; এর যন্ত্রণাবোধ তাঁকে অন্তরে বিদ্ধ করেছে এবং তাঁর কাব্যকে তিক্ত ও বক্র করে তুলেছে।' 'অন্নদামঙ্গলে' এই তিক্ততা বিচিত্র ভঙ্গীতে, বিচিত্র ভাষায় এবং বিচিত্র উপকরণ ও উপলক্ষে নানাভাবে ঝরে পড়েছে।

না।"

২.খ. 'অন্নদামঙ্গল'/ভারতচন্দ্র : অন্নদামঙ্গল রচয়িতা মধ্যযুগের অন্তিম প্রহরের শেষ বড় কবি রায়গুণকর ভারতচন্দ্র রায় [১৭১২?-১৭৬০]। নিশাবসানের লক্ষণ যেমন উজ্জ্বলতম শুকতারায় প্রকট, ঠিক তেমনি মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের **ভালোমন্দ** শেষ হয়েছে ভারতচন্দ্রের কাব্য-জ্যোতিকে আশ্রয় করে। তাঁর রচনার তালিকা হচ্ছে : ১. অন্নদামঙ্গল, ২. রসমঞ্জরী, ৩. সত্যপীরের ব্রতকথা : দুটি, ৪. চণ্ডীনাটক এবং ৫. নাগাষ্টক সহ নানা কবিতা। এর মধ্যে প্রচলিত 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যকে অবলম্বন করেই ভারতচন্দ্রের প্রতিভা বিচার্য। বহু আলোচিত ঐ 'অন্নদামঙ্গল' **তিনটি খণ্ডে** সম্পূর্ণ : **অ.** অন্নদা-মঙ্গল বা 'অন্নপূর্ণামঙ্গল' ; **আ.** কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দরের কথা এবং **ই.** মানসিংহ পালা। এই তিনটি খণ্ড সবদিক থেকেই তিনটি পৃথক কাব্য হলেও কবি যেমন ভাবে মূল 'অন্নদামঙ্গল' বা 'অন্নপূর্ণামঙ্গল' এর কাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কহীন বিদ্যাসুন্দরের গল্পটিকে জড়িয়ে দিয়েছেন, তেমনি আট দিনে বিভক্ত পালায় অন্নদা ও বিদ্যার কাহিনীর সঙ্গে মানসিংহের পালা ক্রমান্বয়ে একত্রে গীত হলেও বিষয়বস্তুর দিক থেকে এটিও স্বতন্ত্র কাব্য। তথাপি ঐ তিন খণ্ডকে একত্র ধরেই ভারতচন্দ্রের প্রতিভার বিচার করা দরকার।

১৭১২ [?] খ্রিস্টাব্দের ২ মাঘ বর্ধমান জেলার অন্তর্গত ভূরসুট বা ভূরিশ্রেষ্ঠ পরগণার অন্তর্গত পাণ্ডুয়া বা পেঁড়ো [বর্তমানে এই গ্রাম হাওড়া জেলায় অবস্থিত] গ্রামে ভারতচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম নরেন্দ্রনারায়ণ। বর্ধমান-রাজের সঙ্গে বিবাদের কারণে তাঁরা রাজ্য হারিয়ে হতদরিদ্র হয়ে পড়েন। ভারতচন্দ্রের জীবন বিচিত্র অভিজ্ঞতায় পূর্ণ। অর্থকরী ফার্সীর বদলে